বাণী

সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সশস্ত্র বাহিনী দিবসে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার নেতৃত্বে দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সাতজন বীরশ্রেষ্ঠকে যাঁরা মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন সময়ে দেশ ও দেশের বাইরে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে আত্মোৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীর বীর সদস্যদের। আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করি। আমি সশস্ত্র বাহিনীর যুদ্ধাহত সদস্য ও শহিদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা সশস্ত্র বাহিনী জাতির গর্ব ও আস্থার প্রতীক। মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর তিন বাহিনী সম্মিলিতভাবে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর উপর সর্বাত্মক আক্রমণ পরিচালনা করে। তাদের সম্মিলিত আক্রমণে হানাদার বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে যা আমাদের বিজয়কে ত্বরান্বিত করে। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ২১ নভেম্বর একটি স্মরণীয় দিন। মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর অবদান ও বীরত্বগাথা জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার মহান দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহযোগিতাসহ জাতিগঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা প্রশংসনীয়। সম্প্রতি দেশের পূর্বাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ ও মহামারি মোকাবিলায়ও সশস্ত্র বাহিনী কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। কেবল দেশেই নয়, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ নিয়ে পেশাগত দক্ষতা, সর্বোচ্চ শৃঙ্খলা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে চলেছেন।

একটি শক্তিশালী, আধুনিক ও প্রশিক্ষিত সশস্ত্র বাহিনী দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার অন্যতম পূর্বশর্ত। সরকার সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে 'ফোর্সেস গোল ২০৩০' প্রণয়ন করেছে। এর আওতায় সশস্ত্র বাহিনীতে যুক্ত হচ্ছে অত্যাধুনিক সামরিক সরঞ্জাম যা নিঃসন্দেহে সশস্ত্র বাহিনীকে আরো আধুনিক, দক্ষ ও গতিশীল করবে। তবে যেকোনো বাহিনীর উন্নয়নের জন্য নেতৃত্বের প্রতি গভীর আস্থা, পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ, পেশাগত দক্ষতা এবং সর্বোপরি শৃঙ্খলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ রাষ্ট্র ও নেতৃত্বের প্রতি পরিপূর্ণ অনুগত থেকে কঠোর অনুশীলন ও দেশপ্রেমের সমন্বয়ে সশস্ত্র বাহিনীর গৌরব সমুন্নত রাখতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন- এ প্রত্যাশা করি।

আমি সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং বাহিনী সমূহের সকল সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গের অব্যাহত সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ
রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক

সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০২২

বিশেষ ক্রোড়পত্র

মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী

স্বাধীনতার গৌরবদীপ্ত ইতিহাসটি রচিত হয়েছিল এদেশের অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা স্ব স্ব অবস্থান থেকে তৎকালীন পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এদেশের আপামর জনসাধারণকে সাথে নিয়ে সম্মিলিতভাবে সমন্বিত আক্রমণ করে বিজয় নিশ্চিত করে।

সেনাবাহিনী: ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশের আপামর জনতার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছিল তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত অসংখ্য বাঙালি সেনাসদস্য যারা সমগ্র বাংলাদেশে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের আপামর জনতার সাথে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাঙালি সেনাসদস্যরা। ১৯৭১ সালে গঠিত অস্থায়ী মুজিবনগর সরকার কর্নেল (পরবর্তীতে জেনারেল) অবসরপ্রাপ্ত এম এ জি ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ দেয়। এ সময় সমন্বিতভাবে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সমগ্র দেশকে ১১ টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। সেক্টর কমান্ডারগণ সর্বস্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে অসংখ্য সফল সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। সুসংহত ও সমন্বিত যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় ত্বরান্বিত করার প্রয়াসে এক পর্যায়ে এস ফোর্স, জেড ফোর্স ও কে ফোর্স নামে সেনাবাহিনীর ৩ টি নিয়মিত ব্রিগেড গঠন করা হয়। ঐ সময়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ইস্ট বেংগল রেজিমেন্টের ৫টি ব্যাটালিয়ন ছাড়াও যুদ্ধ চলাকালে আরো ৩টি ব্যাটালিয়ন প্রতিষ্ঠা করা হয়। যুদ্ধে গোলন্দাজ সহায়তা প্রদানের জন্য মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত হয় মুজিব ব্যাটারি, রওশন আরা ব্যাটারি ও স্বতন্ত্র রকেট ব্যাটারি। এছাড়া, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করার জন্য ডাইরেক্টরেট অব মেডিক্যাল সার্ভিস যাত্রা শুরু করে। ২১শে নভেম্বর হতে বাংলার আপামর জনতা আর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সম্মিলিত ও পরিকল্পিত আক্রমণে মুক্তিযুদ্ধে যোগ হয় এক নতুন মাত্রা। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দুঃসাহসিক অভিযানের মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনীর পরাজয়কে ত্বরান্বিত করেছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অকুতোভয় সেনাসদস্যরা। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ৫৫ জন অফিসারসহ মোট ১৪৬০ জন সেনাসদস্য আত্মোৎসর্গ করেন।

নৌবাহিনী: ১৯৭১ সালে ঐতিহাসিক সেক্টর কমান্ডারস কনফারেন্সের ঘোষণার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। পাকিস্তান নৌবাহিনীতে কর্মরত ফ্রান্স থেকে পালিয়ে আসা কিছু সংখ্যক বাংলাদেশি সাবমেরিনার ও তরুণদের সমন্বয়ে গড়ে তোলা হয় নৌ কমান্ডো দল। তারা দেশের প্রধান নদী বন্দরগুলোতে 'অপারেশন জ্যাকপট' নামক দুঃসাহসী আক্রমণ পরিচালনা করেন। এই অপারেশনের মাধ্যমে নৌ কমান্ডোগণ সারাদেশে বিভিন্ন নদী বন্দরে খাদ্য ও রসদ বোঝাই প্রায় ২৬টি শত্রুজাহাজ ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি ২টি গান বোট "পদ্মা" ও "পলাশ" পশুর নদীতে জাহাজ বিধ্বংসী মাইন স্থাপনের মাধ্যমে পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজসহ বেশ কিছু বাণিজ্যিক জাহাজ ধ্বংস করে। এই আক্রমণে পাক হানাদারদের রসদ ও অস্ত্র সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। তারা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধে নৌসেনাদের এই বীরত্ব ও আত্মত্যাগ আমাদের স্বাধীনতার পথকে ত্বরান্বিত ও সুগম করে। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বসূচক অবদান এবং আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ০১ জন সদস্যকে বীরশ্রেষ্ঠ, ০৫ জন সদস্যকে বীর উত্তম, ০৮ জন সদস্যকে বীর বিক্রম এবং ০৯ জন সদস্যকে বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

বিমান বাহিনী: দেশের প্রয়োজনে বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা ও বিমানসেনাগণ আপামর জনতার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। বিমান বাহিনীর কর্মকর্তাগণ ডেপুটি চীফ অব স্টাফ ও সেক্টর কমান্ডারের মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর একটি অটার বিমান, একটি ড্যাকোটা বিমান ও একটি অ্যালুয়েট হেলিকপ্টার এবং পাকিস্তান বিমান বাহিনীর পক্ষ ত্যাগকারী বাঙালি বৈমানিক, কারিগরি পেশার বিমানসেনা ও বেসামরিক বৈমানিকদের সমন্বয়ে ভারতের নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে 'কিলো ফ্লাইট' নামে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর যাত্রা শুরু হয়। 'কিলো ফ্লাইট' মুক্তিযুদ্ধে প্রথম বাংলার আকাশসীমায় প্রবেশ করে ০৩ ডিসেম্বর মধ্যরাতে চট্টগ্রাম এবং নারায়ণগঞ্জের জ্বালানি ডিপোর উপর অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সফল বিমান আক্রমণ পরিচালনা করে। এর ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ হয় নতুন মাত্রা। মুক্তিযুদ্ধের শেষভাগে পাকিস্তানি লক্ষ্যবস্তুসমূহের উপর ৫০টি সফল বিমান আক্রমণ পরিচালনা করে। 'কিলো ফ্লাইট' আকাশপথে সফল আক্রমণ পরিচালনার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়কে ত্বরান্বিত করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বসূচক অবদান এবং আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ০১ জন সদস্যকে বীরশ্রেষ্ঠ, ০৬ জন সদস্যকে বীর উত্তম, ০১ জন সদস্যকে বীর বিক্রম এবং ১৫ জন সদস্যকে বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধে বিমান বাহিনীর সদস্যদের অবদান জাতির কাছে চির প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

বাণী

'সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সদস্যকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ দিনে আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন উৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীর সকল শহিদ ও মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী, সাহসী এবং ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে স্বাধীনতা অর্জন করে।

আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের ২১-এ নভেম্বর একটি বিশেষ গৌরবময় দিন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অকুতোভয় সদস্যরা এ দিনে সম্মিলিতভাবে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণের সূচনা করেন। মুক্তিবাহিনী, বিভিন্ন আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যগণ ও দেশপ্রেমিক জনতা এই সমন্বিত আক্রমণে একতাবদ্ধ হন। দখলদার বাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করে ১৬ই ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির অগ্রযাত্রা ও বিজয়ের স্মারক হিসেবে প্রতি বছর ২১-এ নভেম্বর 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস' পালন করা হয়।

জাতির পিতা স্বাধীনতার পর একটি আধুনিক ও চৌকশ সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। সেনাবাহিনীর জন্য তিনি মিলিটারি একাডেমি, কম্বাইন্ড আর্মড স্কুল ও প্রতিটি কোরের জন্য ট্রেনিং স্কুলসহ আরো অনেক সামরিক প্রতিষ্ঠান এবং ইউনিট গঠন করেন। তিনি চট্টগ্রামে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ঘাঁটি ঈসা খান উদ্বোধন করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৎকালীন যুগোশ্লাভিয়া থেকে নৌবাহিনীর জন্য দুটি জাহাজ সংগ্রহ করা হয়। বিমান বাহিনীর জন্য তিনি তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সুপারসনিক মিগ-২১ জঙ্গি বিমানসহ হেলিকপ্টার, পরিবহন বিমান ও রাডার সংগ্রহ করেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনীকে দেশে ও বিদেশে উন্নততর প্রশিক্ষণ প্রদানসহ আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত করছি। জাতির পিতার নির্দেশে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের উপযোগী ১৯৭৪ সালে প্রণীত প্রতিরক্ষা নীতিমালার আলোকে ফোর্সেস গোল-২০৩০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আওতায় তিন বাহিনীর পুনর্গঠন ও আধুনিকায়নের কার্যক্রমসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনী দুর্যোগ মোকাবিলা, অবকাঠামো নির্মাণ, আর্তমানবতার সেবা, বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা এবং বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছেন। এভাবে সশস্ত্র বাহিনী আজ জাতির আস্থার প্রতীক হিসেবে গড়ে উঠেছে।

আওয়ামী লীগ সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। আমি আশা করি, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দেশপ্রেম, পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাবেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমরা সক্ষম হবো, ইনশাআল্লাহ।

আমি 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০২২'- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

বাণী

সেনাবাহিনী প্রধান
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

'একুশে নভেম্বর' বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম গৌরবময় ও তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিন, যা বাঙালি জাতির দেশপ্রেম, সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের প্রতীক হিসেবে পরিগণিত। ১৯৭১ সালের এই দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অকুতোভয় বীর সেনানীরা মুক্তিকামী আপামর জনতার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে জল, স্থল ও আকাশ পথে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত ও সুপরিকল্পিতভাবে অপ্রতিরোধ্য আক্রমণের সূচনা করেছিল। এই সুসংগঠিত ও সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলে ত্বরান্বিত হয় আমাদের চূড়ান্ত বিজয় এবং ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। তাই আজ আমরা 'একুশে নভেম্বর' বাংলাদেশের 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপন করতে পেরে গর্বিত।

'স্বাধীনতা' বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অর্জন। লাখো প্রাণের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন মানচিত্র এবং লাল-সবুজের জাতীয় পতাকা। প্রতি বছর, 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস' আমাদেরকে সেই নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের কথা স্মরণের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করে। আজকের এই মহতী দিনে, আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের স্বাধীনতার রূপকার এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি বাঙালি জাতির মুক্তি ও কল্যাণের জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন। আমি শ্রদ্ধাভরে আরো স্মরণ করছি আমাদের প্রিয় সশস্ত্র বাহিনীসহ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, যারা মহান স্বাধীনতার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং যুদ্ধাহত হয়েছেন। আমি বিশেষভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সেই সকল বীর শহীদদের প্রতি যারা মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী সময় প্রিয় মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি মহান আল্লাহর নিকট তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। মুক্তিযুদ্ধের অদম্য চেতনাকে হৃদয়ে ধারণের জন্য আমি সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যদের প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গত বছর আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকীর সাথে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করেছি। জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশকে ক্রমাগত উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীও ক্রমাগত আধুনিক সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিশ্বমানের একটি বাহিনীতে পরিণত হচ্ছে। 'ফোর্সেস গোল-২০৩০' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে আধুনিক ট্যাংক, স্বয়ংক্রিয় গ্রেনেড লঞ্চার, মাল্টিপল লঞ্চ রকেট সিস্টেম, দূরপাল্লার সারফেস-টু-সারফেস এবং সারফেস-টু-এয়ার ফায়ার ডেলিভারি সিস্টেম, এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, গ্রাউন্ড সারভাইল্যান্স রাডার, আনম্যান্ড এরিয়াল ভেহিক্যাল (ইউএভি) ইত্যাদি সংযোজনের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর আভিযানিক সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর্মি এভিয়েশন গ্রুপের জন্য নতুন এভিয়েশন বেস তৈরির পাশাপাশি নতুন হেলিকপ্টার এবং বিমান সংযোজন করা হয়েছে, যা দূর্গম এলাকায় জরুরী রশদ ও সরঞ্জামাদি সরবরাহের পাশাপাশি জরুরী রোগী স্থানান্তরের জন্যও ব্যবহৃত হচ্ছে। আধুনিক দূরপাল্লার ওয়ারলেস সেট এবং অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেম সংযোজনের মাধ্যমে আমাদের যুদ্ধকালীন যোগাযোগ সক্ষমতায় নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। এছাড়াও, কম্ব্যাট ইঞ্জিনিয়ারের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে যুক্ত হয়েছে অত্যাধুনিক ফ্লোটিং ব্রীজ, প্ল্যান্ট ভেহিক্যাল, এলসিটি এবং টিসিভি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এখন দেশে ও বিদেশে একটি সুশৃঙ্খল, দক্ষ, পেশাদার এবং অনুকরণীয় বাহিনী হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে একটি সক্ষম ও আধুনিক বাহিনীতে রূপান্তরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং সকল প্রকার সহায়তা প্রদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলতে পারি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জাতির গর্ব হিসেবে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী একবিংশ শতাব্দীর যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সর্বদা প্রস্তুত। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিশেষ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা দেশের দুর্যোগ মোকাবিলা, দুস্থদের সহায়তায় এবং দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডসহ যে কোন প্রয়োজনে সর্বাত্মক আত্মনিয়োগের মাধ্যমে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান করে। সাম্প্রতিক বন্যায় সেনাবাহিনীর সদস্যরা অতিদ্রুততার সাথে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্যের জন্য তাদের পাশে দাড়িয়েছে; যা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। এছাড়াও, জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং দেশের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নেও নিরলসভাবে কাজ করছে সেনাবাহিনী।

দেশের গন্ডি পেরিয়ে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিভিন্ন যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাসহ দুস্থ মানুষদের পাশে দাড়িয়ে তাদের মন জয় করতে সমর্থ হয়েছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক সশস্ত্র বাহিনীর নারী সদস্যরা অংশগ্রহণ করছে। সেনাবাহিনীর মহিলা অফিসারদের মধ্যে কয়েকজন ইতোমধ্যে শান্তিরক্ষা মিশনে কন্টিনজেন্ট কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জাতিসংঘের অধীনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী এখন যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশগুলোর মানুষের কাছে বড় আস্থা ও বন্ধুত্বের প্রতীক এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত। বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের ত্যাগ, শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা এবং পেশাগত দক্ষতায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ এখন শীর্ষ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ, যা আমাদের সকলের জন্য একটি বড় অর্জন এবং গর্বের বিষয়।

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী আমাদের জাতির শক্তি, ঐক্য ও গর্বের প্রতীক। 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস' আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উজ্জীবিত করে সকলকে দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগের অনুপ্রেরণা যোগাবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এই দিনের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে আমরা সৈনিক হিসেবে দেশ ও জাতির কল্যাণে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকব। সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আমি বাংলাদেশের জনগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এই বিশেষ দিনে, আমি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যকে দেশের জন্য নিঃস্বার্থ ত্যাগ এবং আত্মনিয়োগের জন্য কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাই। 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশে যারা কাজ করেছেন, তাদের সবাইকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সহায় হোন। বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক। জয় বাংলা।

এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ
জেনারেল

বাণী

নৌবাহিনী প্রধান
বাংলাদেশ নৌবাহিনী

২১ নভেম্বর, সশস্ত্র বাহিনী দিবস। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবোজ্জ্বল দিন। ১৯৭১ সালের এ দিনে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সাথে সাধারণ মানুষ একত্রিত হয়ে পাক সেনাদের বিরুদ্ধে একযোগে জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে অপ্রতিরোধ্য আক্রমণ শুরু করে। দুর্দমনীয় ও অপ্রতিরোধ্য সম্মিলিত এই আক্রমণে হানাদার বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং ত্বরান্বিত হয় আমাদের কাঙ্ক্ষিত ও বহুল প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা। বিশ্ব মানচিত্রে সূচিত হয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের নাম।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বজ্রকণ্ঠের উদাত্ত আহ্বান দিশেহারা জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দেয় সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ। পরিবার-পরিজন ছেড়ে তারা জীবন বাজি রাখে মাতৃভূমিকে স্বাধীন করতে। পরাধীন ঘরে না ফেরার পথে বলীয়ান হয় বাঙালি জাতি। আজকের এ দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল বীর সেনানীকে, যাঁদের নির্লোভ দেশপ্রেম আর নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ উপহার দিয়েছে একটি স্বাধীন দেশ। মাগফিরাত কামনা করছি সে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পরাধীনতার গ্লানি হতে মুক্ত হয়েছি। একইসাথে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি প্রিয়জন হারা শোকসন্তপ্ত শহিদ পরিবারবর্গের প্রতি।

দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য আজ সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে নিয়োজিত। আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সমুদ্রসীমার অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। জাতির পিতার হাতে গড়া নৌবাহিনী তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় আজ একটি কার্যকর ও পেশাদার ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বাহিনীতে যুক্ত হয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আধুনিক যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিন, হেলিকপ্টার, মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ারক্রাফট ও আধুনিক সামরিক সরঞ্জাম। যুদ্ধকালীন প্রস্তুতির পাশাপাশি নৌসদস্যগণ বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজের গমনাগমন নির্বিঘ্ন রাখাসহ সরকার ঘোষিত সুনীল অর্থনীতির কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক ও মানবিক উন্নয়নে অবদান রাখা, পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিশাল সমুদ্র অঞ্চলে অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সমুদ্র পথে মানবপাচার ও চোরাচালানরোধ, জলদস্যুতা দমন, নিরাপদ মৎস্য আহরণসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে আপামর জনতার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করছে। সাম্প্রতিক সময়ে সিলেট, সুনামগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রলয়ংকরী বন্যায় নৌসদস্যগণ উদ্ধার অভিযান ও বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় অর্থ সহায়তা, ত্রাণসামগ্রী প্রদানসহ অন্যান্য কার্যাবলীতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছে। দেশের গন্ডি পেরিয়ে শান্তির বার্তা নিয়ে দেশ হতে দেশান্তরে বয়ে চলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নৌবাহিনী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমনই একটি দক্ষ ও পেশাদার নৌবাহিনীর স্বপ্ন দেখেছিলেন।

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আমি সশস্ত্র বাহিনীর সকল স্তরের সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের সুস্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি ও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করছি। মহান এ দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে দৈনিক পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের মহতী উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য ২১ নভেম্বরের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করবে-এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আজকের এ বিশেষ দিনে আমি সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করছি। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলের সহায় হোন।

জয় বাংলা।

এম শাহীন ইকবাল
এডমিরাল

বাণী

বিমান বাহিনী প্রধান
বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

বাঙালির বীরত্ব, সাহস এবং উৎসর্গের প্রতীক সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদযাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত। এই বিশেষ দিনে আমি ও বিমান বাহিনীর সদস্যগণ সশস্ত্র বাহিনীর ভ্রাতৃত্বের চেতনাকে পুনরুদ্দীপ্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি এবং সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গকারী শহিদদের নিঃস্বার্থ অবদানের অনুস্মরণ আমাদেরকে আবেগপ্রবণ করার পাশাপাশি গর্বিত করে। নিরন্তর আত্মত্যাগের মাধ্যমে বীর শহিদরা আমাদের শিখিয়ে গেছেন যে, দেশের জন্য জীবন উৎসর্গের চেয়ে বড় গৌরবের আর কিছু নেই। আমি বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করছি, যিনি প্রতিটি বিমানসেনার জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী এমন একটি বাহিনী যা যুদ্ধের ময়দানে জন্ম লাভ করেছে। আমি কিলো ফ্লাইটের সদস্যদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যারা আমাদের স্বাধীনতা অর্জন ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গঠনে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছেন।

আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য গর্বিত, যিনি আমাদের এনে দিয়েছিলেন স্বাধীনতা ও লাল সবুজের পতাকা। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বের দ্বারা তিনি একটি সুসংগঠিত ও আধুনিক সশস্ত্র বাহিনী গঠন করেছিলেন। অতঃপর বাংলাদেশ বিমান বাহিনী তিনটি পুরাতন যুদ্ধবিধ্বস্ত বিমানের স্থলে অত্যাধুনিক মিগ-২১, এমআই-৮, এএন-২৪, এএন-২৬ ও র‍্যাডার দ্বারা সজ্জিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে চতুর্থ প্রজন্মের বিভিন্ন সরঞ্জাম সংযোজনের মাধ্যমে একটি কার্যকরী বিমান বাহিনী গঠনে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সশস্ত্র বাহিনী দিবস এবং মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনা আমাদের প্রায়োগিক অপারেশনাল সক্ষমতা উন্নত করার প্রতিশ্রুতিকে পুনরুজ্জীবিত করে। বিগত চার দশকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বিজিবিকে সহায়তা প্রদানের জন্য ৫০,০০০ ঘন্টারও অধিক উড্ডয়ন করেছে। জাতীয় পতাকা বহন করে দেশের সীমানা পেরিয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সামরিক উড্ডয়নে বিশ্বস্ত অবদানকারী হিসেবে প্রভূত প্রশংসা বয়ে এনেছে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী তার প্রতিশ্রুতিতে নিবদ্ধ এবং একবিংশ শতাব্দীর সশস্ত্র বাহিনীকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি দিয়ে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। এ বিশেষ দিনে, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী দেশের আকাশসীমা রক্ষা ও জাতীয় স্বার্থে কাজ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছে। বিমান বাহিনীকে গৌরবের নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে এবং জাতীয় যেকোনো প্রয়োজনে নিজেদের বিলিয়ে দিতে বিমান বাহিনীর প্রতিটি সদস্য আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরার জন্য আমি সশস্ত্র বাহিনী বিভাগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি নিশ্চিত, এই উদ্যোগ নতুন প্রজন্মের মাঝে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনা সঞ্চার করবে। এটি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার দৃঢ় বন্ধনকেও অনুরণিত করবে। আমি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করছি। আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন। আল্লাহ হাফেজ। জয় বাংলা।

শেখ আব্দুল হান্নান
এয়ার চীফ মার্শাল

দেশমাতৃকার অমর সন্তান তোমরা থাকবে স্মৃতিতে অম্লান

বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ সিপাহী হামিদুর রহমান

বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল

বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ ইআরএ-১ মো: রুহুল আমিন

বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান

বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ

বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী দেশের জন্য নিবেদিত
সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ

দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সদা প্রস্তুত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী

সেনাবাহিনী: 'সমরে আমরা শান্তিতে আমরা, সর্বত্র আমরা, দেশের তরে'-এ মূলমন্ত্রে দীক্ষিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্যাপ্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র সংযোজন করে অপারেশনাল সক্ষমতাকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০১১ সালে 'ফোর্সেস গোল-২০৩০' প্রণয়ন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সিলেটে ১৭ পদাতিক ডিভিশন, রামুতে ১০ পদাতিক ডিভিশন, টাংগাইলে বঙ্গবন্ধু সেনানিবাস এবং লেবুখালিতে ৭ পদাতিক ডিভিশন ও শেখ হাসিনা সেনানিবাস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পদ্মা সেতুর নির্মাণ তদারকি ও নিরাপত্তার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে শেখ রাসেল সেনানিবাস। সেনাবাহিনীকে তথ্য প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তথ্য প্রযুক্তি পরিদপ্তর এবং সংযোজিত হয়েছে আধুনিক ডাটা সেন্টার ও স্যাটেলাইট হাব। প্রশিক্ষণের মান যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এ্যান্ড টেকনলজি, আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিং, এনসিও'স একাডেমির মত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আর্মি এভিয়েশনকে পূর্ণাঙ্গ রূপদানের লক্ষ্যে উন্নতমানের এবং অত্যাধুনিক হেলিকপ্টার ও এয়ারক্রাফট সংযোজিত হয়েছে। পেশাদারিত্বের মান বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যদেরকে সারা বছর বিভিন্ন প্রশিক্ষণে নিয়োজিত থাকতে হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ২০২১/২০২২ সালে প্রথমবারের মত আয়োজন করা হয় লজিস্টিকস্ এফটিএক্স 'অনুশীলন নবদিগন্ত'। এছাড়া, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বন্ধুপ্রতীম দেশসমূহের সাথে যৌথ ও বহুজাতিক সামরিক অনুশীলনে অংশগ্রহণ করছে। এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্যের অর্জিত সামরিক জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটে। এভাবেই আধুনিক সমরাস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জামাদিতে সজ্জিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দেশের জনগণের আস্থার প্রতীক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শান্তিরক্ষী ভূমিকায় বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আজ সম্মানজনক একটি আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে।

নৌবাহিনী: প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই "শান্তিতে সংগ্রামে সমুদ্রে দুর্জয়'-এ মূল মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সদাজাগ্রত ও সদাপ্রস্তুত রয়েছে এবং একটি পেশাদার শক্তিশালী ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীতে পরিণত হয়েছে। নৌবাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে দুটি আধুনিক সাবমেরিন বানৌজা নবযাত্রা ও জয়যাত্রা, আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধজাহাজ-ফ্রিগেট, করভেট, লার্জ পেট্রোল ক্রাফট, জরিপ জাহাজ ও বিশেষ নৌকমান্ডো দল সোয়াড্স। এছাড়া, সমুদ্রে জরুরি উদ্ধার ও টহল পরিচালনার জন্য নৌবহরে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট ও হেলিকপ্টার সুবিধা সম্বলিত নেভাল এভিয়েশান। পাশাপাশি নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কুতুবদিয়াস্থ পেকুয়ায় সাবমেরিন ঘাঁটি 'বানৌজা শেখ হাসিনা' এবং পটুয়াখালীর কলাপাড়াস্থ রাবনাবাদ চ্যানেলের পার্শ্ববর্তী এলাকায় 'বানৌজা শের-ই-বাংলা' ঘাঁটি নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নৌসদস্যদের আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। আধুনিকায়নের পাশাপাশি নিয়মিতভাবে সমুদ্র মহড়ায় অংশগ্রহণ ও যুদ্ধের কলাকৌশল অনুশীলন, উদ্ধার অভিযান পরিচালনা এবং নৌস্থাপনাসমূহের প্রতিরক্ষা মহড়া ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সদা প্রস্তুত বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

বিমান বাহিনী: 'বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত'-এ মূলমন্ত্রে উদ্দীপ্ত বাংলাদেশ বিমান বাহিনী আকাশসীমা রক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে সর্বদা নিয়োজিত। স্বাধীনতার পরপরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতায় তৎকালীন অত্যাধুনিক সুপারসনিক যুদ্ধবিমান, পরিবহন বিমান, হেলিকপ্টার ও এয়ার ডিফেন্স র‌্যাডার সংযোজনের মাধ্যমে একটি আধুনিক ও শক্তিশালী বিমান বাহিনীর যাত্রা শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায়, বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিভিন্ন সময়ে বিমান বাহিনীতে সংযোজিত হয় চতুর্থ প্রজন্মের অত্যাধুনিক MiG-29 যুদ্ধবিমান, F-7BGI যুদ্ধবিমান, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত C-130J পরিবহন বিমান, Mi-171SH হেলিকপ্টার, AW-139 মেরিটাইম সার্চ এন্ড রেসকিউ হেলিকপ্টার, অত্যাধুনিক এয়ার ডিফেন্স র‌্যাডার, আবহাওয়া র‌্যাডার, এটিএস র‌্যাডার ও ক্ষেপণাস্ত্র। বিমান বাহিনীর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক বিমান, র‌্যাডার, যুগোপযোগী সামরিক সরঞ্জাম সংযোজন এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রতিটি সদস্য অত্যাধুনিক এসব বিমান, হেলিকপ্টার ও সরঞ্জামের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রাখতে সদা প্রস্তুত।

দেশ সেবা ও অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমে সশস্ত্র বাহিনী

সেনাবাহিনী: দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অত্যন্ত দক্ষতা এবং সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করছে। দেশের যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন জরুরি স্থানান্তর, উদ্ধার অভিযান, খাদ্য/ত্রাণ সরবরাহ, ঔষধ বিতরণ, আবাসন, চিকিৎসা সেবাসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ইতোমধ্যেই ৯৬টি মোতায়েন সম্পন্ন করেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ১৯৭৪-২০২১ সালে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত বন্যা এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ ও চিকিৎসা সেবা প্রদানে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। করোনা মোকাবিলায় সেনাবাহিনীর অবদান অনস্বীকার্য। করোনা মোকাবিলায় সম্মুখ সারির যোদ্ধা হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশের প্রতিটি অঞ্চলে সাধারণ জনগণের মাঝে করোনা প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি এবং বিদেশ থেকে আগত ব্যক্তিবর্গের জন্য কোয়ারেন্টাইন সেন্টার স্থাপন ও ব্যবস্থাপনাকল্পে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দুস্থ ও অসহায় পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। এর পাশাপাশি জনসাধারণের মাঝে লিফলেট, মাস্ক, হ্যান্ড গ্লোভস, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান ইত্যাদি স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়। বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদানে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকেই বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত দেশের বিভিন্ন সেনানিবাসে ৪১টি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ এবং ২০টি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ও কলেজ পরিচালিত হচ্ছে। বিশেষ শিশুদের জন্য বিশেষ স্কুল 'প্রয়াস' বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এক অসাধারণ উদ্যোগ যার মোট ১১টি শাখা রয়েছে। উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি), আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ (এএফএমসি), ক্যাডেট কলেজ, মিলিটারি কলেজিয়েট স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে বর্তমানে ০৫টি মেডিক্যাল কলেজ পরিচালিত হচ্ছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভৌত সুরক্ষা ও সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব পালন করছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, এমআরপি ও ই-পাসপোর্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। দেশ ও জনগণের প্রয়োজনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কার্যপরিধি বিস্তৃত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের সেবা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।

নৌবাহিনী: দেশের যেকোনো প্রাকৃতিক ও নৌ দুর্ঘটনায় উদ্ধার অভিযান ও ত্রাণ-তৎপরতায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। বাংলাদেশের বিশাল সমুদ্র এলাকার সার্বভৌমত্ব রক্ষা, সমুদ্র সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, সমুদ্র পথে চোরাচালানরোধ, জলদস্যু দমন, উপকূলীয় এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং সমুদ্র এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ৬ থেকে ৮টি জাহাজ সার্বক্ষণিকভাবে সমুদ্রে টহল প্রদান করছে। দেশের জলসীমার সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বিধানের পাশাপাশি নৌবাহিনী দেশের যেকোনো নৌ দূর্ঘটনায় উদ্ধার অভিযান ও ত্রাণ-তৎপরতায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে যেমন-০৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বঙ্গোপসাগরের অদূরে ডুবোচরে আটকে পড়া বোট থেকে ১৮ জন ক্রুকে জীবিত উদ্ধার করে এবং ২১ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বঙ্গোপসাগরে কুতুবদিয়ার অদূরে ইঞ্জিন বিকল হয়ে ২দিন ভেসে থাকা 'এফবি গাউসুল আজম' নামক একটি মাছ ধরার নৌকা থেকে ১২ জেলেকে জীবিত উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। ১৯ জুলাই ২০২২ বন্যা ও দুর্যোগ মোকাবিলায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সাহায্যার্থে নৌবাহিনীর সকল সদস্যদের ১ দিনের সমপরিমাণ বেতন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে প্রদান করা হয়। দেশের ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল অসহায় দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ-২ নামে প্রকল্পের অধীনে ১৯৯৭ হতে অদ্যাবধি সর্বমোট ৩,৫৫৩টি ব্যারাক হাউজ হস্তান্তর করা হয়েছে। শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে নৌবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি দেশের ব্লু ইকোনোমি বাস্তবায়ন ও দক্ষ জনবল তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এর পাশাপাশি নৌবাহিনী 'আশার আলো' প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছে যা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। মায়ানমারের বলপূর্বক বাস্তুচ্যূত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীদের জন্য স্বল্পতম সময়ে নোয়াখালীর ভাসানচরে লক্ষাধিক রোহিঙ্গাদের সাময়িক আশ্রয় প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক মানের অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি ৩০,৭৯২ জন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ভাসানচরে স্থানান্তর করা হয়েছে। নৌবাহিনীর সদস্যরা এ পর্যন্ত শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সর্বমোট ৬,৩৭০ কর্মকর্তা ও নাবিক, ৩০টি দেশে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অত্যন্ত দক্ষতা, পেশাদারিত্ব ও সুনামের সাথে দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে ৭টি দেশে ৩৫৬ জন কর্মকর্তা ও নাবিক আর্ন্তজাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত আছেন। তাছাড়া, এ পর্যন্ত সংঘাতপূর্ণ ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজের জীবনের চরম ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ৪ জন নৌসদস্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।

বিমান বাহিনী: দুর্যোগময় মুহূর্তে দেশের যেকোনো স্থানে মেডিক্যাল ইভাকুয়েশন, ক্যাজুয়ালটি ইভাকুয়েশন, উদ্ধার এবং অনুসন্ধান কাজে বছরের ৩৬৫ দিনই বিমান বাহিনীর বিমান ও হেলিকপ্টার ২৪ ঘন্টা প্রস্তুত রাখা হয়। কোভিড-১৯ প্রতিরোধকল্পে বিমান বাহিনীর প্রত্যেক ঘাঁটিতে চিকিৎসা সহায়ক সামগ্রী প্রদান, জীবাণুনাশক ছিটানো, জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগণের মাঝে খাদ্য ও উপহারসামগ্রী বিতরণ করে। তাছাড়াও, দেশের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারের মাধ্যমে করোনাভাইরাসের টিকা পৌঁছে দেয়া হয়। উদ্ধার ও অগ্নিনির্বাপণ কর্মকাণ্ডে বেসামরিক প্রশাসনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে বিমান বাহিনী। পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলের শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিজিবিসহ অন্যান্য আইন
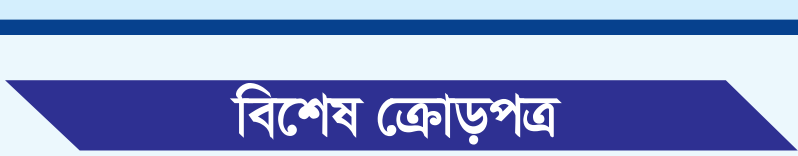
বিশেষ ক্রোড়পত্র

শৃঙ্খলা বাহিনী এবং বেসামরিক প্রশাসনের কার্যক্রমের সাথে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। বিমান বাহিনী হেলিকপ্টারের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের জন্য নিয়মিত খাদ্য, রসদ ও জনবল পরিবহন এবং মেডিক্যাল ইভ্যাকুয়েশনের কাজ পরিচালনা এবং সামরিক ও বেসামরিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের পরিদর্শন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান সফলতার সাথে পালন করে আসছে। বাংলাদেশের আকাশসীমার উপর 'আকাশ প্রতিরক্ষা শনাক্তকরণ এলাকা' নির্ধারণের পর 'এয়ার ডিফেন্স নোটিফিকেশন সেন্টার' চালু করা হয়েছে, যা দেশের আকাশ প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার স্বেচ্ছায় গমনেচ্ছুক বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের কক্সবাজার জেলার কুতুপালং থেকে নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত ভাসানচরে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। স্থানান্তরকালে তাদেরকে কক্সবাজার থেকে যাত্রা শুরুর পর চট্টগ্রামস্থ বিমান বাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হকের অস্থায়ী ক্যাম্পে রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করা হয়। পরে ভাসানচরে স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে তাদেরকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হয়। ১৯৯৩ থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর আট হাজারের অধিক সদস্য কুয়েত, পূর্ব তিমুর, আইভরি কোস্ট, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, দক্ষিণ সুদান, হাইতি, মালিসহ পৃথিবীর বিভিন্ন সংঘাতময় দেশে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন সম্পন্ন করেছে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর শান্তিরক্ষীরা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিজ দায়িত্ব পালন ছাড়াও বিভিন্ন জনহিতকর কাজ সম্পাদন করে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছেন।

তাৎপর্যময় ২১ শে নভেম্বর

মেজর ইমতিয়াজ পারভেজ, আর্টিলারি
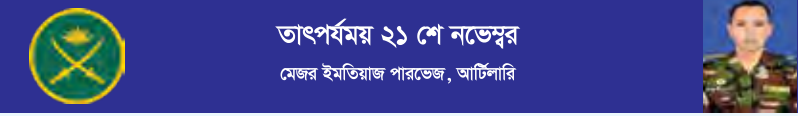
১৯৭১ সালের ২১শে নভেম্বরে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী একীভূত হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিবাহিনীর সাথে। এ দিনে বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী সম্মিলিতভাবে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সুসংগঠিত আক্রমণের সূচনা করে। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় সর্বস্তরের মুক্তিপাগল হাজার হাজার তরুণ যুবক ও বাংলার সাধারণ জনগণ দ্বারা গঠিত মুক্তিবাহিনী। ২৫ শে মার্চ ১৯৭১ এর কালরাত্রির পর থেকে চলে আসা গেরিলা যুদ্ধ ধারণ করে সুসংগঠিত রূপ। পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে জল, স্থল ও আকাশ পথে সম্মিলিত আক্রমণ চালানো সম্ভব হয় যা ত্বরান্বিত করে ১৬ই ডিসেম্বর এর চূড়ান্ত বিজয়কে। মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন সামরিক বাহিনীর সদস্যদের অবদানকে সাধারণ জনতার আত্মত্যাগের সঙ্গে একীভূত করে দেখা হয় ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবস পালনের মাধ্যমে। ২৫ শে মার্চের কালরাত্রির পর থেকেই মূলত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলার মুক্তিকামী জনসাধারণের সশস্ত্র সংগ্রামের সূচনা। এই সংগ্রামকে সামনে থেকে সংগঠন ও নেতৃত্ব প্রদান করেছিলো তৎকালীন পাকিস্তানি সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে কর্মরত বাঙ্গালি সদস্যরা যারা পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী ত্যাগ করে বাংলার মুক্তিপাগল সাধারণ জনসাধারণের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। বিভিন্ন পাড়া-মহল্লা ও গ্রামে-গঞ্জে মুক্তিকামী জনগণকে সংগঠিত করে মৌলিক সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করেন। তাদেরই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মুক্তিকামী জনসাধারণ পরিণত হন এক একজন সুদক্ষ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যোদ্ধায়। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী এবং ভারতে অবস্থিত মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পগুলোতেও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা মুক্তিকামী হাজার হাজার জনসাধারণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মুক্তিবাহিনী তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ থেকে পরিচালিত হয় মুক্তিবাহিনী কর্তৃক দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা অভিযান। এই গেরিলা যোদ্ধা বাহিনীসমূহের যুদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং নেতৃত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সশস্ত্র বাহিনীর বাঙ্গালির তৎকালীন বাঙ্গালি সদস্যদের হাতেই ন্যাস্ত ছিলো। ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষনায় সাড়া দিয়ে বাঙ্গালি অফিসার ও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ পাকিস্তান সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী ত্যাগ করে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন। হানাদার বাহিনীর তান্ডবলীলার জবাবে অস্ত্র তুলে নেয় বিপ্লবী ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস পুলিশ, আনসার। পরবর্তীতে পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত সেনা, নৌ এবং বিমান বহিনীর সদস্যরা সুযোগমত সেখান হতে পালিয়ে যুদ্ধে যোগদান করে। মুজিব নগরে গঠিত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার কর্নেল এমএজি ওসমানীকে (পরবর্তীতে জেনারেল) মুক্তিবহিনীর প্রধান নিয়োগ করে মুক্তিবাহিনীকে পুনর্গঠনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সারাদেশকে বিভক্ত করা হয় ১১টি সেক্টরে যার নেতৃত্ব প্রদান করা হয় একেকজন সুদক্ষ ও পেশাদার সশস্ত্র বাহিনী কর্মকর্তাদের। যুদ্ধের চতুর্থ মাসে 'জেড ফোর্স' নামক ব্রিগেড গড়ে তোলার মাধ্যমে যুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাংগঠনিকভাবে নবজন্ম হয়েছিল। পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে 'এস ফোর্স' এবং 'কে ফোর্স' নামক সংগঠন কাজ শুরু করে। প্রায় একই সময়ে মুজিব ও রওশন আরা ব্যাটারী নামক দুটি আর্টিলারী ইউনিট সংগঠিত হয়ে সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌ-কমান্ডো বাহিনী পরিচালিত প্রথম অভিযান ছিল 'অপারেশন জ্যাকপট'। ১৯৭১ সালের ১৬ই আগস্ট প্রথম প্রহরে দেশের প্রধান দুই সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম ও মোংলা এবং দুইটি নদীবন্দর চাঁদপুর ও নারায়ণগঞ্জে একযোগে অপারেশনগুলো পরিচালিত হয়। এই অপারেশনে পশ্চিম পাকিস্তান এবং আরো কয়েকটি দেশ থেকে আসা অস্ত্র, খাদ্য ও তেলবাহী ২৬টি জাহাজ ডুবিয়ে দেয়া সম্ভবপর হয়েছিল। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রায় পাঁচশত বিমানসেনা ও ৩৫ জন অফিসার পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। ২৮ সেপ্টেম্বর ভারতের ডিমাপুরের পরিত্যক্ত বিমানঘাঁটিতে অত্যন্ত গোপনভাবে গোড়াপত্তন হয় ক্ষুদ্র বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর, যার নাম দেয়া হয়েছিল 'কিলো ফ্লাইট'। কিলো ফ্লাইট বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রথম ফ্লাইং ইউনিট যা জন্মের ৬৬ দিনের মাথায় কার্যকরী হয়ে মুক্তিযুদ্ধে কার্যকরী অবদান রেখেছিল। ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে চট্টগ্রামের পতেঙ্গার ইস্টার্ন রিফাইনারি ও নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল তেল ডিপোতে কিলো ফ্লাইটের মাধ্যমে আক্রমণ চালানো হয়। চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট ও ভৈরবসহ মোট ৫০টি অপারেশনে কিলো ফ্লাইট বীরত্বের সাক্ষর রাখে। মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধি এবং দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর উপর ত্রিমুখী আক্রমণের সক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে কিলো ফ্লাইটের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আট মাস পর ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর চূড়ান্তভাবে সম্মিলিত আক্রমণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। সেদিন স্থল, নৌ ও আকাশ পথে কর্নেল (পরবর্তীতে জেনারেল) ওসমানীর নেতৃত্বে চালানো হয় ত্রিমুখী আক্রমণ। উন্মুক্ত হয় বিজয়ের পথ। শত্রুপক্ষ বাধ্য হয় পশ্চাদপসারণে। ফলশ্রুতিতে, ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতি ছিনিয়ে আনে চূড়ান্ত বিজয়। প্রকৃতপক্ষে এ বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছিল ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বরের তিন বাহিনীর সুসংগঠিত সম্মিলিত আক্রমণ। দেশের প্রতিরক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ আর জনগণের জন্য ভালোবাসা-এ দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী। শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি হচ্ছে-'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়'। কিন্তু যদি আক্রান্ত হয় তাহলে শত্রুর আক্রমণের যথোপযুক্ত জবাব যেন দেয়া যায়, সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও চর্চা করে চলেছেন। "সমরে আমরা শান্তিতে আমরা, সর্বত্র আমরা, দেশের তরে", "শান্তিতে সংগ্রামে সমুদ্রে দুর্জয়" এবং "বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত"-এ তিন মূলমন্ত্রে দীক্ষিত বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর চৌকশ সদস্যগণ দেশ ও জাতির অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় জল, স্থল ও আকাশ পথে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আজকের পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তিন বাহিনীর ধ্যান ধারণা, চিন্তা-চেতনার আধুনিকায়ন একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ। 'ফোর্সেস গোল ২০৩০' এর আলোকে সশস্ত্র বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো বিন্যাস ও পরিবর্তনের পাশাপাশি আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। এর ফলে সম্পদের সুষম ব্যবহার এবং জনবলের দক্ষতা অর্জনের সুযোগ আরো বেড়ে যাবে। মুক্তিযুদ্ধে বাংলার আপামর জনসাধারণের সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের অবদানকে স্মরণ করার জন্য প্রতিবছর সশস্ত্র বাহিনী দিবস পালন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মৃতিতে নির্মিত 'শিখা অনির্বাণে' পুস্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে দিবসটির শুভ সূচনা করেন। এ দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের মাধ্যমে আগামী প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের অবদান সম্পর্কে আরো বিশদ ভাবে জানতে পারবে এবং শহিদ সেনাসদস্যদের প্রতি আরো শ্রদ্ধাশীল হবে- এটাই জাতির প্রত্যাশা। একুশে নভেম্বর আন্তঃবাহিনীর বিভিন্ন শ্রেনি পেশাজীবীদের মধ্যে এবং বেসামরিক-সামরিক সম্পর্কের মধ্যে মেলবন্ধন তৈরি করেছে। এরই ফলশ্রুতিতে দুর্যোগে, উদ্‌যাপনে, অর্জনে সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের সব মানুষের পাশে থেকে সশস্ত্র বাহিনী হয়ে উঠেছে দেশের জাতির আস্থার প্রতীক। সশস্ত্র বাহিনীর চৌকশ সদস্যরা দেশের অখণ্ডতা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে সংবিধান সমুন্নত রাখার আদর্শিক প্রেরণায় তাদের উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব নিরলসভাবে পালন করে যাচ্ছেন। এসবের মধ্যে নিহিত রয়েছে ২১ শে নভেম্বরের তাৎপর্য।

বৈরুত বিস্ফোরণে বানৌজা বিজয়- এক ভয়াবহ দুর্যোগের সাক্ষী

কমডোর এম জয়নাল আবেদীন, (এনডি), এনজিপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন

২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনী UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) মোতায়ন রয়েছে। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে বানৌজা বিজয় একমাত্র জাহাজ হিসেবে UNIFIL যোগদানের জন্য ১১০ জনের কন্টিনজেন্টসহ লেবাননের বৈরুত পৌঁছায়। প্রায় ১ বছর অতিবাহিত হলে কন্টিনজেন্টের সদস্যদের পরিবর্তন করা হয় অর্থাৎ নতুন দল গমন করে। এরকমই নতুন দল হিসেবে জুন ২০১৯ থেকে কন্টিনজেন্ট এবং জাহাজের দায়িত্ব নেয়ার জন্য অফিসার, জেসিও, পিও এবং নাবিকবৃন্দ বানৌজা ঈসা খানে প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতির জন্য সমবেত হয়। তারপর ৩ মাসের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ৮ জুলাই ২০১৯ তারিখে বিমানযোগে লেবানন গমন করে এবং এক বছরেরও অধিক কাল ২০২০ সালের অক্টোবর পর্যন্ত নীল হেলমেট পরিহিত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। এ সময় বৈরুত বন্দরে বানৌজা বিজয়-এ ০৪ আগষ্ট ২০২০ সালে ঘটে যায় এক ভয়াবহ দুর্যোগ। আনুমানিক ১৭৫০ ঘটিকায় অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত ঘটে। ঘন ঘন বিস্ফোরণের ফলে আগুনের তীব্রতা বেড়ে যায় এবং একটি কন্টেইনারের মহাবিস্ফোরণ ঘটে। বানৌজা বিজয় নাবিকদের জন্য এ বিস্ফোরণটি ছিল জীবনের কঠিনতম বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া। জাহাজের উপরে এবং জেটিতে সকলেই লাশের মত পড়ে থাকে। বিস্ফোরণ এতই ব্যাপক এবং বিধ্বংসী ছিল যে, এর শব্দকম্পন ১৫০ মাইল দূরে সাইপ্রাস ও জর্ডানেও অনুভূত হয়। বৈরুত শহরের প্রায় ৪০-৫০ কিঃমিঃ দূরের বাড়িঘরের কাঁচ ও জানালা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কিংবা পড়ে গিয়েছে। দূরদূরান্তে বিল্ডিং এর ভিতরে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি এবং প্রাণহানি ঘটে। কোনো এক অজানা কারণে আগুন ধরায় ফায়ার ওয়াটার ক্রাফটেও আগুন ধরে যায় যা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটকে বোমার মত বিস্ফোরণ ঘটাতে সাহায্য করে। এভাবে একসঙ্গে ২৭৫০ টন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট একটি আনবিক বোমার শক্তিতে বিস্ফোরিত হয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে। জাহাজের বাইরে যে তিনজন বিস্ফোরণের মুহুর্তে সিড়ি বেয়ে উঠছিল তারা মারাত্মক আহত হয়। তাদের একজন রশিদ, যার মাথার খুলি ভেঙ্গে কিছুটি ভিতরে ডেবে যায় এবং অজ্ঞান হয়ে যায়। অপর দু'জন বাবলু, আরইএ-৪ ও এম এ আজিজ এল/এস তাদের দু'জনের হাত কয়েক টুকরা হয়ে ভেঙ্গে যায়। জাহাজের উপরেও কয়েকজন গুরুতর আহত হয়। তন্মধ্যে অন্যতম পিও কাউসার, কমান্ডার মাহতাব (ইঞ্জিনিয়ার অফিসার), লেঃ কমান্ডার রেদওয়ান, কমান্ডার মাহবুব (ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার) প্রমুখ। এ ভয়াবহ দূর্যোগ মোকাবিলায় সর্বপ্রথম বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধান ফোন দিয়ে দিকনির্দেশনা দেন এবং শান্তিরক্ষীদের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশ করেন। এতে তাদের মনোবল বেড়ে যায়। বিস্ফোরণের আহতদের উদ্ধারে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। লেবাননে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল মুজতাহিদ ঘটনাস্থলে প্রথম বাংলাদেশি সিনিয়র অফিসার হিসেবে পরিদর্শনে আসেন ও তার গাড়ি মারফত সবচেয়ে গুরুতর আহতদেরকে বৈরুতস্থ আমেরিকান হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে জাতিসংঘের প্রেরিত এ্যাম্বুলেন্সে করে আহতদেরকে বৈরুত এয়ারপোর্টে নেওয়া হয়। সেখান থেকে জাতিসংঘের হেলিকপ্টারে করে আরেকটি জেলার জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত অসামরিক হাসপাতালে পাঠানো হয়। এভাবে সারারাত ধরে উদ্ধার অভিযান চলতে থাকে এবং শেষ ব্যক্তি ভোর ০৪টার সময় হাসপাতালে যেতে সক্ষম হয়। এর মধ্যে চীফ ইআরএ রশিদকে হাসপাতালের লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়। জাহাজটি সর্বতোভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ মহাবিস্ফোরণে অত্যন্ত সুসংগঠিত লেবাননের প্রধান পোর্ট মুহুর্তেই ধ্বংস হয়ে ধুলায় মিশে যায়। বৈরুত পোর্টের চেয়েও বাইরের শহর এলাকায় ক্ষতি হয়েছে অনেক বেশী। বড় বড় ইমারতসমূহের মূল কাঠামো ছাড়া সকল দরজা, জানালা, আসবাবপত্র ও ইলেকট্রনিক আইটেম সবকিছু ধ্বংস হয়ে উড়ে যায় এবং এতে অনেক মানুষ আহত এবং নিহত হয়। সরকারি হিসেব অনুযায়ী ২১৮ জন মানুষ নিহত হয়। বৈরুত পোর্টের মধ্যে মাত্র কয়েকজন নিহত হয়, নিহত বাকী সকলেই পোর্টের বাহিরে ছিল। আনুমানিক প্রায় ০৭ হাজার লোক আহত হয় এবং ০৩ লক্ষ এর অধিক লোক ঘর-বাড়ি ছাড়া হয়। পোর্টে যারা নিহত হয়েছিল তাদের লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি, কারণ দুর্ঘটনাস্থলের নিচে প্রায় ৪০ ফুট গর্ত হয়ে গিয়েছিল। বিস্ফোরণের ভয়াবহতা এতই ব্যাপক ছিল যে, বানৌজা বিজয় এর মতো বড় জাহাজ ডাঙ্গায় উঠে যায়। এই বিস্ফোরণের পরপরই একটি সুনামির সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে বানৌজা বিজয় ঢেউয়ের তালে পিছনে এবং সামনে যাওয়ার কারণে ০৪টি রশি ছিড়ে যায় ও কোনো রকমে শেষ ০২ টি রশির মাধ্যমে জাহাজকে নিয়ন্ত্রণ করে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। লেবানন নৌবাহিনীর স্থাপনাও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেকগুলো জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ০২টি যাত্রীবাহী জাহাজ কাত হয়ে ডুবে যায়, আরো একটি জাহাজ ডুবে যায়। ফলে পোর্টের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় এবং কয়েকদিনের জন্য পোর্টে জাহাজ আসা বন্ধ হয়ে যায়। লেবানন নৌবাহিনীর জানমালের ক্ষয়ক্ষতির কারণে তারা সকলকে সহযোগিতা করতে পারেনি। এছাড়া, পোর্টের বিভিন্ন স্থাপনায় অনেককেই পাওয়া যাচ্ছিলনা। পরবর্তী কয়েকদিন লাশের গন্ধ আসছিল এবং লাশের গন্ধে টিকা মুশকিল হয়ে যাচ্ছিল। তাছাড়া, বৈরুতের সকল রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারণ জানালার কাচ, আসবাবপত্র এবং বিভিন্ন জিনিস রাস্তায় পড়ে ছিল। বিস্ফোরণের ফলে গোটা বৈরুত শহর ধ্বংসলীলায় পরিণত হয় এবং বৈরুত তথা লেবানন হয়ে উঠে সারা বিশ্বে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী ও ঔষধ সরবরাহ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারও বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সি ১৩০ উড়োজাহাজে করে যথেষ্ট পরিমাণ ঔষধ সরবরাহ করে। এ ভয়াবহ বিস্ফোরণ থেকে কিছু লক্ষণীয় এবং শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, যেমন- গুজবে কান দিতে নেই, মানবিক মূল্যবোধ প্রদর্শন করা, সমন্বিত চেষ্টায় উদ্যোগী হওয়া, মনোবল অটুট রাখা, সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা এবং শৃঙ্খলা রক্ষায় সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়া। ১৫ দিন পর সচল হয়ে বানৌজা বিজয় মহান আল্লাহ পাকের অশেষ কৃপায় প্রায় ১ মাস ধরে সুদীর্ঘ সমুদ্র পথ পাড়ি দিয়ে শান্তিরক্ষীদের নিয়ে চট্টগ্রাম প্রত্যাবর্তন করে এবং মাননীয় নৌবাহিনী প্রধান স্বয়ং অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

বঙ্গবন্ধুর ভিশন ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে সশস্ত্র বাহিনীর অর্জন

স্কোয়াড্রন লীডার মোঃ শাহ আলম, বিপিপি, শিক্ষা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার কেন্দ্রবিন্দু ও বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা। গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ এবং জনগণের প্রতি মমত্ববোধের কারণে তিনি হয়ে ওঠেন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা। ভাষা আন্দোলন হ'তে শুরু করে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত তিনি ছিলেন চিরন্তন প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির আহ্বান জানান এবং ২৬ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শিক নেতৃত্বে পরিচালিত দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পরাজিত হয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাক বাহিনী ঢাকায় আত্মসমর্পণ করে, অভ্যুদয় হয় পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের। স্বাধীনতা লাভের পর একটি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতির উপর দাঁড়িয়ে জাতির পিতা দেশের শাসনভার হাতে নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুসংহত করার জন্য দরকার একটি সুপ্রশিক্ষিত, সুশৃঙ্খল ও দক্ষ সশস্ত্র বাহিনী। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ০৭ এপ্রিল এক সরকারি আদেশে মুক্তিযুদ্ধকালীন সাংগঠনিক কাঠামো 'বাংলাদেশ ফোর্সেস' ভেঙে স্বতন্ত্র বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গড়ার নির্দেশ দেন এবং দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে দক্ষ ও চৌকশ সশস্ত্র বাহিনী গঠনের কাজ শুরু করেন। জাতির পিতার পরিকল্পনায় স্বাধীনতার পরপরই ঢাকায় ৪৬ পদাতিক ব্রিগেড, যশোরে ৫৫ পদাতিক ব্রিগেড এবং কুমিল্লায় ৪৪ পদাতিক ব্রিগেড প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। তাছাড়াও, তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রতিটি আর্মস ও সার্ভিসের গোড়াপত্তন হয় এবং শতাধিক ইউনিট প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তিনি ১৯৭২ সালে ঢাকায় দেশের প্রথম অফিসার প্রশিক্ষণ একাডেমি চালুর ব্যবস্থা করেন। ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে সেনাবাহিনীর ০৮ জন ও বিমান বাহিনীর ০১ জন অফিসারকে ভারত পাঠানো হয় নতুন ক্যাডেট নির্বাচন প্রক্রিয়ার উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্যে। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের হাতেই গড়ে ওঠে ইন্টার সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ড (আইএসএসবি)। ১৯৭৩ সালের ২৯ নভেম্বর কুমিল্লায় প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি। দেশে নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠার জন্যে বঙ্গবন্ধু মূলত স্বাধীনতার পূর্বেই ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলনে এ ভূখন্ডে নৌবাহিনী সদর দপ্তর স্থাপনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে নৌবাহিনীর ভিত রচনা করেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে জাতির পিতা প্রায় শূন্য থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনী গঠনের কাজ শুরু করেন। একটি দক্ষ, শক্তিশালী ও আধুনিক নৌবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি তিনটি নৌবাহিনী ঘাঁটি বানৌজা হাজী মহসিন, বানৌজা ঈসা খান ও বানৌজা তিতুমীর স্থাপন করেন। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক প্রয়াসে সংগ্রহ করা হয় ০৫টি আধুনিক রণতরী এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে প্রদান করা হয় 'নেভাল এনসাইন'। দেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণে মহান এ রাষ্ট্রনায়ক ১৯৭৪ সালে প্রণয়ন করেন 'টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস এন্ড মেরিটাইম জোনস এ্যাক্ট'। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সামরিক কৌশলগত দিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিধি ও সম্ভাবনার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল একটি আধুনিক, শক্তিশালী ও পেশাদার বিমান বাহিনী গঠনের। এ প্রেক্ষিতে তাঁর দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তে স্বাধীনতার পরপরই বিমান বাহিনীতে সংযোজিত হয় তৎকালীন সময়ের অত্যাধুনিক মিগ-২১ সুপারসনিক যুদ্ধবিমান, এএন-২৪ বিমান ও এএন-২৬ পরিবহন বিমান, এমআই-৮ হেলিকপ্টার ও এয়ার ডিফেন্স র‌্যাডার। বঙ্গবন্ধু উন্নত ও পেশাদার সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ১৯৭৪ সালে প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্ণ হলো ২০২১ সালে। একই সঙ্গে দেশে পালিত হয় জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী। এ এক অবিস্মরণীয় মিলনমেলা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে বলেছিলেন "আমাদের কেউ দাবায়ে রাখতে পারবা না।" জাতির পিতার সেদিনের সে স্বপ্ন আর বিশ্বাস তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রজ্ঞা ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বর্তমানে পরিপূর্ণ এক বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। দেশের অব্যাহত অগ্রগতির সাথে সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী। জাতির পিতার সূচিত সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের পূর্ববর্তী ও বর্তমান মেয়াদকালে সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে নেয়া হচ্ছে নানামুখী যুগান্তকারী পদক্ষেপ। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন সিস্টেমকে ডিজিটালাইজড করতে এবং তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়নের লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু প্রণীত প্রতিরক্ষা নীতিমালার উপর ভিত্তি করে বর্তমান সরকার কর্তৃক 'ফোর্সেস গোল-২০৩০' প্রণয়ন করা হয়। এর আওতায় সেনাবাহিনীতে একাধিক পদাতিক ডিভিশন, ব্রিগেড এবং আর্মি ওয়ার গেইম সেন্টারের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেনাবাহিনীর প্রতিটি কোর ও সার্ভিসে সংযোজিত হয়েছে অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র, সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি। বাংলাদেশ নৌবাহিনী আজ একটি পেশাদার ত্রিমাত্রিক বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। এ বাহিনীতে যুক্ত হয়েছে আধুনিক সারফেস ফ্লিট, সাবমেরিন, নেভাল অ্যাভিয়েশন, নৌ কমান্ডো সোয়াডস্ এবং বৃদ্ধি পেয়েছে নৌঘাঁটি ও অবকাঠামোগত সুবিধা। বিমান বাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে একাধিক বিমান ঘাঁটি, ইউনিট, অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান, পরিবহন বিমান, হেলিকপ্টার, র‌্যাডার, ক্ষেপণাস্ত্র ও যুগোপযোগী সামরিক সরঞ্জাম। সশস্ত্র বাহিনীতে প্রশিক্ষণের মান যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আন্তর্জাতিকমানের উচ্চ শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। জাতির পিতা স্বপ্ন দেখেছিলেন, আমাদের সামরিক বাহিনীর জন্য এমন একটি আধুনিক ও আন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষণ একাডেমি হবে যা গোটা পৃথিবীর মানুষ দেখতে আসবে। জাতির পিতা যে একাডেমির স্বপ্ন দেখেছিলেন, তারই বাস্তবায়িত রূপ আজকের বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি, নেভাল একাডেমি এবং বিমান বাহিনী একাডেমি। বর্তমানে এই একাডেমিসমূহে স্ব স্ব বাহিনীর অফিসার ক্যাডেটদের সাথে বন্ধুপ্রতিম বিভিন্ন দেশের অফিসার ক্যাডেটগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। আধুনিক সশস্ত্র বাহিনীর স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন সৎ, যোগ্য ও দক্ষ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর মাধ্যমেই আমাদের দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন থাকবে, যা আজ বাস্তবে প্রতিফলিত। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জাতি গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণের পাশাপাশি বিশ্ব শান্তিরক্ষায় আজ আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর রয়েছে অসামান্য অবদান। জাতির পিতা সশস্ত্র বাহিনীর যে সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করে গেছেন তার উপর দাঁড়িয়ে বর্তমান সশস্ত্র বাহিনীর পেশাদারিত্ব এবং কর্মদক্ষতার পরিচিতি দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্বীকৃত ও প্রশংসিত।